দ্বীপ

সৌমিত্র বসু

আলো সব ফুটছে। সেই আবছার মধ্যে দেখা যায় সমুদ্রকে, দুলে দুলে যাচ্ছে বিছিয়ে থাকা একটা বিশাল পর্দার মতো। একটিমাত্র মানুষ বসে আছে সমুদ্রের পাড়ে, দূরের দিকে তার চোখ। কুয়াশা সরিয়ে দিগন্ত বেরিয়ে আসছে ক্রমশ, মানুষটার চোখ দেখে মনে হয়, সেই দিগন্তে সে একটা কিছু দেখতে পাচ্ছে যা আমরা পাচ্ছি না। সেটা একটা দ্বীপ।

আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে পুরীতে এক্সকারশনে গিয়েছিল একদল ছেলেমেয়ে। এক আধ বছরের এদিক-ওদিক বাদ দিয়ে তাদের গড় বয়স তখন আঠেরো কি উনিশ। জমি কলকাতা থেকেই তৈরি ছিল, যে দুজন কমবয়সি প্রফেসর এসেছিলেন সঙ্গে তাঁদেরও প্রশ্রয় ছিল, অন্যরকম একটা কিছু হয়েই গেল ব্রত আর মল্লিকার মধ্যে। পুরী থেকে চলে আসবার আগের দিন দুপুরে তারা দুজনে বেরিয়ে এসেছিল গেস্ট হাউস থেকে। সমুদ্রের ধারে হাতে হাত রেখে বসেছিল অনেকক্ষণ। ব্রত বলেছিল, ওই দূরে দেখেছিস। সমুদ্র আর আকাশ যেখানে একসঙ্গে মিলেছে, ওখানে দেখতে পাচ্ছিস? মল্লিকা জিজ্ঞেস করেছিল, কী? ব্রত বলেছিল, একটা দ্বীপ। ওই দ্বীপটা আমি কিনব।

উনিশ বছর বয়েস তখন, যে কোনো মিথ্যেকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করতে এতটুকু বাধত না। মজা করে কথার পিঠে কথা চাপাতে চাপাতে একসময় দুজনকেই দেখতে পেয়েছিল, সত্যি সত্যি ওখানে একটা দ্বীপ আছে। দ্বীপটাকে মনের মতো করে তৈরি করেছিল তারা দুজন। জঙ্গল আছে, কিন্তু বুনো জন্তু নেই। হরিণ আছে, অজস্র পাখি আছে, সন্ধেবেলায় তাদের মন খারাপ করে দেওয়া ডাক। সেখানে বালির ওপর তারা দুজনে মিলে একটা ছোট্ট বাড়ি বানাবে। সারাদিন ধরে সমুদ্রের নোনা হাওয়া, সারাদিন ধরে রোদ্দুর। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় তাদের দুজনের দ্বীপটা দোলের দিনের বিকেল বেলার মতো নানা রঙে অদ্ভুত হয়ে থাকবে।

ব্রত আর মল্লিকার প্রেমটা টিকল না শেষ পর্যন্ত। পরীক্ষার পর পরই মল্লিকার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল, রেজাল্ট বেরোনোর আগেই সে সম্বন্ধ ফাইনাল। ব্রতর কিছু করার উপায়ই ছিল না। মল্লিকা তার মাকে বলেছিল ব্রতর কথা, কিন্তু সমবয়সি ছেলে, জাতে মেলে না, সবচেয়ে বড়ো কথা এখনও লেখাপড়া করছে,

কবে পাশ করবে, কবে চাকরি পাবে তার অপেক্ষায় তো মেয়েকে বসিয়ে রাখা যায় না। তবু মা খবরটা দেবার মতো করে বাবাকে বলেছিল, বাবা স্রেফ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, মল্লিকার কাছেও বাবা মায়ের যুক্তিগুলো অকাট্য বলে মনে হতে লাগল। কোনো কান্নাকাটি, পালিয়ে যাবার চেষ্টা বা এই ধরনের নাটকীয় আর কিছুই ঘটল না। বিয়েবাড়ি ভাড়া নেওয়া হল, হৈ চৈ সানাই ইত্যাদির মধ্যে সম্প্রদান হয়ে গেল, ব্রত ছাড়া সকলেই নেমন্তন্ন খেল, মল্লিকা যথোচিত লজ্জা লজ্জা মুখে তার স্বামীর ঘর করতে ঢুকল।

আর ব্রত? বিয়ের দিন সকালে একটা ছোট্ট চিরকুট এসেছিল তার হাতে। আমাকে ক্ষমা করিস। ক্ষমা? কীসের ক্ষমা? কলকাতায় ফিরে এসে লেকের ধারে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, এমনকি আচমকা বৃষ্টির দিনে ক্লাস পালিয়ে এক ছাতার তলায় হাঁটতে হাঁটতে তাদের প্রিয় খেলা হয়ে উঠেছিল ওই সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপটাকে নানারকম করে সাজানো। তারা দুজনেই কি আর জানত না, এটা আসলে খেলাই, কিন্তু এটাও জানত, ভালোবেসে বেঁচে থাকাটাও আসলে খেলার মতোই কিছু একটা, ইচ্ছে মতো রং ছড়িয়ে আঁকা একটি ছবির মতো ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিচ্ছু নয়।

মল্লিকার বিয়ে হয়ে গেল। ব্রত-র রেজাল্ট খারাপ হল। এখানে ওখানে চাকরির চেষ্টা দেখে। পায় না। কম্পিউটার শেখে। টিউশনি করে। একজন প্রফেসারের বকলমে নোটবই লেখে। বাবার হার্ট অ্যাটাক করল, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকার পালা এবার শেষ। যখন বুঝতে পারছে দাঁড়াবার জায়গা ক্রমে ছোটো হয়ে আসছে, প্রাণপণে অকল্পনীয় কিছু একটা ঘটবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে বাঁকা পিঠে হেঁটে যাচ্ছে প্রত্যেকটা দিন, ঠিক এইরকম একটা সময়ে যে বাড়িতে টিউশনি করত, মেয়েটির বাবা মা একদিন এলেন তাদের বাড়ি। ব্রতর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা হল। নিজেদের মেয়ের সঙ্গে ব্রতর বিয়ে দিতে চান। হঠাৎ? একটা ঘটনা আছে এর পেছনে, সেটা লুকোবো না। ব্রতর ছাত্রী, টুকি বছর দেড়েক আগে একবার পালিয়ে গিয়েছিল পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে। দিন তিনেক পরে দীঘা থেকে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। ব্রত তাকে বিয়ে করুক, টুকির বাবার ব্যবসা সে-ই দেখাশোনা করবে।

মা জিজ্ঞেস করেছিল, ব্রত একবারও ভাবেনি। রাজি না হওয়ার তো কিছু ছিল না। এমন কত দাগ লাগে জীবনে, ব্রতর জীবনেও কি নেই এমন কোনো দাগ? সম্পর্কটা ঠিক হয়ে যাবার পর থেকে সে আর টুকিকে পড়ায় না, মাঝে মাঝে যায় তাদের বাড়ি। ভাবী জামাই হিসেবে টুকির বাবা-মার সঙ্গে গল্প করে, তাঁরা ব্যস্ত হয়ে বা না-হয়ে কোনো কাজে উঠে যান, থেকে যায় টুকি। সে এখন প্রায় বউ হওয়া

গলাতেই কথা বলে ব্রতর সঙ্গে। ব্রতর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় টুকিকে জিজ্ঞেস করে, সেই ছেলেটাকে তো নিশ্চয় মনে আছে তোমার? মিস কর তাকে? জিজ্ঞেস তো করাই যায়। এ বিয়ে যে ভাঙবার কোনো উপায় নেই তা তারা দুজনেই জানে। তবু থাক, সব আড়াল সরাতেই হবে কী মানে আছে তার?

সামনের সপ্তাহেই তাদের বিয়ে। হানিমুন কোথায় হবে তাও ঠিক হয়ে আছে, টিকিট কাটা, হোটেল বুকিং সারা। এই সময়ে হঠাৎ করে একা একা পুরী যাবার কী দরকার পড়ল টুকি তা বুঝতে পারল না। বউ বউ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল টুকি, ব্রত একটু হেসেছিল। সে হাসি দেখে বোঝা যায়, না গিয়ে সে ছাড়বে না। টুকিও জেদ করল না। বিয়ের আগেই স্বামীকে সে কোনো কোনো জায়গায় ছেড়ে দিতে শিখেছে। আসলে তারা দুজনেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে, অন্যের ব্যাপারে কৌতূহল একটা জায়গায় এনে থামিয়ে দেবে। টুকির বাবা-মাও কিছু প্রশ্ন করেননি। বিয়ের আগের সপ্তাহটা বর বউয়ের দেখা না হওয়াই তো ভালো। ব্রত কাল সন্ধেবেলা এসে পৌঁছেছে এখানে, আর আজ ভোর থেকে সমুদ্রের ধারে।

সূর্যের একটা লাল আলো ঢেউয়ের পিঠে পিঠে জল পার হয়ে ভেজা বালির ওপর লম্বা হয়ে পড়েছে। আকাশ পরিষ্কার। দিগন্তের কাছে একটা দুটো জেলে নৌকো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দ্বীপটা? দু-চোখকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে ব্রত। মাঝে মাঝে যে চোখ মুছতে হচ্ছে তা নিশ্চয় অমন করে তাকিয়ে থাকার জন্যেই। ওই তো, ওই তো সেই দ্বীপ। ব্রত হঠাৎ স্পষ্ট দেখতে পেল। জঙ্গল আছে, কিন্তু বুনো জন্তু নেই। হরিণ আছে, অজস্র পাখি, সন্ধেবেলায় তাদের মন খারাপ করে দেওয়া ডাক। বালির ওপর একটা ছোট্ট বাড়ি। সারাদিন ধরে সমুদ্রের নোনা হাওয়া, সারাদিন ধরে রোদ্দুর। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় দ্বীপটা দোলের দিনের বিকেল বেলার মতো নানা রঙে অদ্ভুত হয়ে আছে।

উঠে পড়ল ব্রত। দ্বীপটা থাকল, থেকে গেল বুকের মধ্যে। তার স্ত্রী সেই দ্বীপে কোনোদিন পা রাখতে পারবে না।